OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 11
Website: https://tirj.org.in, Page No. 88 - 96
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 88 - 96
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

কবি রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় মৃত্যুর গতিবিধি

রণজিৎ দাস
Email ID : ranjitdas7384@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Death,
Stereotypes,
Hedonism,
Truth of life,
Philosophy of life,
Perceiving death,
Philosophy of death,
The eternal flow of life and death.

Abstract

Death is an extreme fact of human life. No matter how much we love life, one day we have to accept death. But no one wants to accept death easily. Standing on the threshold of death, we still have the urge to live. But life and death are so interrelated. Even one life attains perfection only with death. Therefore, the idea of death appears repeatedly in the thoughts of various writers. Because literature is not something outside society, literature is a mirror of society itself. Since human life and human society are included in sorrow, the subject of sorrow as well as the subject of death is generally present in literature. This study examines the concept of death in Rabindranath's poetry. Analyzing Rabindranath's death thoughts, it is seen that there is diversity in his death thoughts. In the early poems, he presents death in one way, and in the later poems in another way. In this case, Rabindranath Tagore's philosophy of life has definitely influenced his poetry.

Discussion

মৃত্যু মানব জীবনের এক চরম সত্য। মৃত্যুকে উপেক্ষা করে কখনোই প্রকৃতির নিয়ম সম্পূর্ণতা পায় না। জীবন এবং মৃত্যু একই মুদ্রার দুটি পৃষ্ঠ, যারা উভয়েই উভয়ের পরিপূরক। তবে এই জীবন এবং মৃত্যু সম্পর্কে পরম্পরাগতভাবে বাঁধাধরা কিছু বিশ্বাস আমাদের মধ্যে প্রোথিত হয়ে গিয়েছে। যার উপর ভিত্তি করে আমরা জীবনকে যতটা সহজ ভাবে এবং ভালোবেসে বরণ করে নেই, মৃত্যুকে ঠিক ততটাই ভীষণ ভেবে এবং ভয় পেয়ে দূরে ঠেলে দেই। যদিও মানুষের এইরূপ আচরণের জন্য দায়ী মানবসুলভই এক প্রবৃত্তি, যাকে দার্শনিকরা 'Hedonism' বা 'সুখবাদ'[১] বলে উল্লেখ করেছেন। এই মতবাদ অনুসারে মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই হল দুঃখকে পরিহার করে সব সময় সুখের অন্বেষণ করা। মানুষ তার ক্রিয়াকলাপ-এর মাধ্যমে সব সময় সুখকে পেতে চায়। মতবাদটিকে সমর্থন করে শ্রী রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় 'সুখ না দুঃখ?' প্রবন্ধে বলেছেন –

> "মানুষ সুখের জন্য লালায়িত এবং দুঃখকে পরিহার করবার জন্য সর্ব্বতোভাবে যত্নশীল। সুখের জন্য, অর্থাৎ সুখ বলিতে যাহা বুঝায় বা যে যা বুঝে, তাহারই জন্য অন্বেষণ ও তাহার লাভের চেষ্টাই জীবন।"[২]

কিন্তু আমাদের চাওয়া না চাওয়ার উপর ভিত্তি করে দুঃখ বা মৃত্যু আসা-যাওয়া করে না। এরা আসে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে এবং অমোঘ সত্যরূপে। তবে একথাও ঠিক যে মৃত্যু ভাবনাতেই যে আমরা কেবলমাত্র দুঃখ পাই, তা নয়। আমাদের জীবনের মধ্যেও লুকিয়ে রয়েছে নানান দুঃখদায়ক উপাদান। স্বয়ং কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাঁর শেষ জীবনে লিখিত

'রূপনারানের কূলে' কবিতায় ঘোষণা করেছেন সেই বাণী। তিনি এখানে বলেছেন - "আমৃত্যু দুঃখের তপস্যা এ জীবন।"[৩] বৌদ্ধ মতাবলম্বী দার্শনিকদের মতানুযায়ী এই জগৎ দুঃখময়। যেহেতু এই জগৎটাই দুঃখময়, তাই জাগতিক জীব হিসেবে আমাদের সর্বত্রই দুঃখের সম্মুখীন হতে হয়।

অন্যদিকে সাহিত্য সমাজেরই একটি দর্পণ। সমাজে ঘটে যাওয়া সমস্ত কিছুই প্রতিবিম্বিত হয়ে ওঠে সাহিত্যে। প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধে লিখেছেন –

> "সকলই নিয়মের ফল। সাহিত্যও নিয়মের ফল। বিশেষ বিশেষ কারণ হইতে, বিশেষ বিশেষ নিয়মানুসারে, বিশেষ বিশেষ ফলোৎপত্তি হয়। জল উপরিস্থ বায়ু এবং নিম্নস্থ পৃথিবীর অবস্থানুসারে, কতকগুলি অলংঘ্য নিয়মের অধীন হইয়া, কোথাও বাস্প, কোথাও বৃষ্টিবিন্দু, কোথাও শিশির, কোথাও হিমকণা বা বরফ, কোথাও কুজ্ঝটিকারূপে পরিণত হয়। তেমনি সাহিত্যেও দেশভেদে, দেশের অবস্থাভেদে, অসংখ্য নিয়মের বশবর্তী হইয়া রূপান্তরিত হয়। সেই সকল নিয়ম অত্যন্ত জটিল, দুর্জ্ঞেয় সন্দেহ নাই; এ পর্যন্ত কেহ তাহার সবিশেষ তত্ত্ব নিরূপণ করিতে পারেন নাই। কোমৎ বিজ্ঞান সম্বন্ধে যেরুপ তত্ত্ব আবিষ্কৃত করিয়াছেন, সাহিত্য সম্বন্ধে কেহ তদ্রূপ করিতে পারেন নাই। তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, সাহিত্য দেশের অবস্থা এবং জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিম্ব মাত্র।"[৪]

সুতরাং অন্যান্য ফলের মতো সাহিত্যও তার নির্দিষ্ট ফল অনুযায়ী সমাজে ঘটে যাওয়া সুখ-দুঃখ, ভালো-মন্দ, নৈতিক-অনৈতিক, ন্যায়- অন্যায়, জীবন - মৃত্যু ইত্যাদি সমস্ত কিছুকেই নিজের মধ্যে স্থান দিয়েছে। ঔপন্যাসিক অদ্বৈত মল্লবর্মণ তাঁর 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে বলেছেন –

> "প্রতি ঘরেই জন্ম হয়, বিবাহ হয়, মৃত্যু হয়। এই তিনটি নিয়াই সংসার। এ তিনের সাহায্যেই প্রকৃতি তার ভারসাম্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছে।"[৫]

এবং এই প্রকৃতিকে নিয়ে, সংসারকে নিয়ে, সমাজকে নিয়েই হয় সাহিত্য। মৃত্যু যেহেতু সেই সংসারেরই এক অনবদ্য অঙ্গ, তাই স্বাভাবিকভাবেই সাহিত্যে স্থান পেয়েছে মৃত্যু প্রসঙ্গ। মৃত্যু ভাবনা নানান সময়ে নানান ভাবে বিভিন্ন সাহিত্যিকদের ভাষায় এবং ভাবনায় স্থান করে নিয়েছে। আবার অনেক সময় কোনো একজন নির্দিষ্ট সাহিত্যিকই বিভিন্ন সময়ে মৃত্যুকে বিভিন্ন রূপে দেখেছেন। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও সেই পর্যায়েরই একজন কবি। রবীন্দ্রনাথের চিন্তা চেতনায় মৃত্যুকে নব নব রূপ পেতে দেখা গিয়েছে। সূচনাপর্বের কবিতার মৃত্যু ভাবনার এবং অন্তিম পর্যায়ের কবিতার মৃত্যুভাবনায় বিশাল তফাৎ লক্ষ্য করা গিয়েছে। এখানে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতায় ফুটে ওঠা মৃত্যুচেতনার গতিপ্রকৃতি নিয়ে আলোকপাত করা হল -

বাংলা সাহিত্যের নানান ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অবদান রাখলেও তিনি ছিলেন মূলত একজন কবি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যিক জীবন শুরু হয়েছে যেমন কবিতা দিয়ে, তেমনই জীবনের অন্তিম সময়েও কবিকে ব্যস্ত দেখা গিয়েছে কবিতা নিয়ে। বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে ব্যাপক অবদানের জন্য তিনি ভূষিত হয়েছেন বিশ্বকবি, কবিগুরু প্রভৃতি নানান উপাধিতে। পাশাপাশি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ-এর সাথে প্রায় সর্বদাই যুক্ত থাকতে দেখা যায় 'রোমান্টিক' বিশেষণটিকে। কবির সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে তিনি রোমান্টিক কবি, জীবনের সমস্ত কিছু ভালো, মঙ্গল, সুখকর, তৃপ্তিদায়ক প্রভৃতি দিক নিয়েই কবির কারবার; অন্যদিকে যা কিছু মন্দ, অমঙ্গলময়, বেদনাদায়ক প্রভৃতি ক্ষেত্রে কবির বিচরণ ততটা হয়নি। একথা কখনোই সম্পূর্ণরূপে সত্যি নয়। কবি স্বয়ং একবার 'চিত্রা'-র ভূমিকায় লিখেছেন –

> "লোক-জীবনের ব্যবহারিক বাণীকে উপেক্ষা করে আমার কাব্যে আমি কেবল আনন্দ, মঙ্গল এবং ঔপনিষদিক মোহ বিস্তার করে তার বাস্তব সংসর্গের মূল্য লাঘব করেছি এমন অপবাদ কেউ কেউ আমায় দিয়েছেন।"[৬]

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনে দুঃখ-কষ্ট কম ছিল না। তবে তিনি সর্বদাই দুঃখকে পরিহার করে সুখকে আশ্রয় করে থাকতেই পছন্দ করতেন। কবির এই মনোভাব তাঁর একটি উপন্যাস 'ঘরে বাইরে' – এর মূল চরিত্র নিখিলেশের চরিত্রের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। নিখিলেশের উক্তি -

> "জীবনটাকে কেঁদে ভাসিয়ে দেওয়ার চেয়ে হেসে উড়িয়ে দেওয়াই ভালো।"[৭]

কবির এতটা সচেতনতা সত্ত্বেও, এতটা বাছাইধর্মী প্রকৃতির হওয়া সত্ত্বেও, কবির কবিতায় বার বার জায়গা করে নিয়েছে কখনো দুঃখ আবার কখনো মৃত্যু প্রসঙ্গ। কারণস্বরূপ রবীন্দ্রনাথের নিজেরই 'সাহিত্য' প্রবন্ধের 'সাহিত্যের তাৎপর্য' অধ্যায় থেকে বলা যায়,

> "বাহিরের জগৎ আমাদের মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আর- একটা জগৎ হইয়া উঠিতেছে। তাহাতে যে কেবল বাহিরের জগতের রঙ আকৃতি ধ্বনি প্রভৃতি আছে তাহা নহে; তাহার সঙ্গে আমাদের ভালোলাগা মন্দ-লাগা, আমাদের ভয়-বিস্ময়, আমাদের সুখ-দুঃখ জড়িত - তাহা আমাদের হৃদয়বৃত্তির বিচিত্র রসে নানা ভাবে আভাসিত হইয়া উঠিতেছে।"[৮]

মানব জীবনকে অনেকেই নদীর সঙ্গে তুলনা করেন। নদী যেমন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বাঁক নিতে নিতে এক সময় সমুদ্রে গিয়ে মিশে যায়, ঠিক তেমনই মানব জীবনও নানান ঘাত-সংঘাতের মধ্য দিয়ে মৃত্যুর মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনও বিভিন্ন সময়ে নানান ঘটনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'জীবনস্মৃতি'-এর 'মৃত্যুশোক' অধ্যায়ে তিনি বলেছেন –

> "ইতিমধ্যে বাড়িতে পরে পরে কয়েকটি মৃত্যুঘটনা ঘটিল। ইতিপূর্বে মৃত্যুকে আমি কোনোদিন প্রত্যক্ষ করি নাই। মার যখন মৃত্যু হয়, আমার তখন বয়স অল্প।"[৯]

কবির নিজস্ব মতানুযায়ী অল্প বয়সের কারণে কবি মায়ের মৃত্যুর স্বরূপকে তখন পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারেননি। কিন্তু পরবর্তীকালে কবির খুবই প্রিয় একজন মানুষ ঠাকুরবাড়ির 'কনিষ্ঠা বধূ' কাদম্বরী দেবীর অকাল মৃত্যুতে কবি খুবই আঘাত পেয়েছিলেন। কবির নিজস্ব বয়ানে –

> "আমার চব্বিশ বছর বয়সের সময় মৃত্যুর সঙ্গে যে পরিচয় হইল তাহা স্থায়ী পরিচয়।"[১০]

মৃত্যুচেতনা কোনকালেই কবিকে সম্পূর্ণ বিবশ করে তুলতে পারেনি। তাইতো এতসব আঘাত- সংঘাতের পরেও কবি রবীন্দ্রনাথ বলতে পেরেছেন –

> "জগৎকে সম্পূর্ণ করিয়া এবং সুন্দর করিয়া দেখিবার জন্য যে - দূরত্বের প্রয়োজন, মৃত্যু সেই দূরত্ব ঘটাইয়া দিয়াছিল। আমি নির্লিপ্ত হইয়া দাঁড়াইয়া মরণের বৃহৎ পটভূমিকার উপর সংসারের ছবিটি দেখিলাম এবং জানিলাম, তাহা বড়ো মনোহর।"[১১]

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মৃত্যু বিষয়টিকে কখনোই প্রক্ষিপ্ত বা অপ্রত্যাশিত রূপে দেখেননি। তিনি বরাবরই এ বিশ্বাস রেখেছিলেন মৃত্যু জীবনেরই একটি পর্যায়। সর্বোপরি মৃত্যুর মধ্য দিয়েই একটি জীবন সম্পূর্ণতা পায়। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো একই ধরনের কথা যেন ফুটে উঠেছে প্রাবন্ধিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও নাট্যকার বাদল সরকারের লেখনীতেও। প্রাবন্ধিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'আমার সাহিত্য- জীবন'- এ উল্লেখ করেছেন মেয়ে 'বুলু'-র কথা, যে মারা গিয়েছিল মাত্র ছয় বছর বয়সে। এই মৃত্যুর পর তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ও অনেকটা একই ধরনের কথা বলেছেন। তিনি বলেন –

> "আমার সমগ্র জীবনে এই আঘাত একটা পরিবর্তন এনে দিলে। জীবন প্রবাহের মোড় ফিরে গেল। আমার জীবনে চলার পথে যে দু-নৌকায় দু-পা রেখে চলা তাতে ছেদ পড়ল। একখানা নৌকাকেই আশ্রয় করে হাল ধরলাম। এই মর্মান্তিক আঘাত না - এলে বোধহয় তা হত না। এবং জীবনে এই বেদনার সুগভীর সমুদ্রে যদি না - পড়তাম, তবে বেদনা-রসকে উপলব্ধি করতে পারতাম না।"[১২]

আবার নাট্যকার বাদল সরকার তাঁর 'বাকি ইতিহাস' নাটকের তৃতীয় অঙ্কে যেখানে সীতানাথের 'দুঃশাসনের রক্তপান', 'জোয়ান অফ্ আর্ক', 'স্পেনের গৃহযুদ্ধ', 'রোমান সম্রাটের নৌবিহার' প্রভৃতি উদ্ভট সমস্ত ছবি সংগ্রহ করার কথা রয়েছে সেখানে শরদিন্দু ও সীতানাথ চরিত্রদ্বয়ের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে একই ভাবনা -

> "শরদিন্দু : এ সব কী ছবি?
> সীতানাথ : (শান্ত স্বরে) খবরের ছবি শরদিন্দু।

শরদিন্দু : বেছে বেছে এইসব ছবি জমা করছো কেন?
সীতানাথ : এই তো ইতিহাস।
শরদিন্দু : ইতিহাস!
সীতানাথ : মানুষের ইতিহাস। জীবনের ইতিহাস।
শরদিন্দু : মিথ্যে কথা! এ মৃত্যুর ইতিহাস।
সীতানাথ : (স্মিত হাস্যে) মৃত্যুকে বাদ দিয়ে কি জীবন হয়?”[১৩]

সাহিত্যিকদের সাহিত্য ভাবনাকে প্রভাবিত করে তাদের নিজস্ব জীবন দর্শন। যেকোনো সাহিত্যিকই তাদের জীবন দর্শনের দ্বারা একটি গভীর সত্যের সন্ধান পায় এবং নির্দিষ্ট একটি তত্ত্বের স্থাপনা করেন। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষা জীবনে প্রথাগত ব্যবস্থার চেয়ে প্রথা বহির্ভূত ব্যবস্থাই ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে ঠাকুর পরিবার এবং পরিবেশ। ঠাকুর পরিবারের প্রতিটি সদস্যতো বটেই, এমনকি তাদের সমস্ত কর্মচারী এবং চাকর-বাকররাও যেন সুশিক্ষিত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনে পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এক বিশাল প্রভাব পড়েছে। ছোটবেলায় তিনি তার পিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে অনবরত চর্চা করে গিয়েছেন গায়ত্রী মন্ত্র, ধর্মীয় বিভিন্ন উপাসনা এবং উপনিষদের মন্ত্র ইত্যাদি। এই উপনিষদের ভাবনার প্রভাব পড়তে দেখা গিয়েছে কবি রবীন্দ্রনাথের সূচনা পর্বের কবিতাগুলিতে। উপনিষদের ভাবনায় ভাবিত হয়েই তিনি এই পর্যায়ে মৃত্যুকে বিভীষিকাময় কোনো কিছু হিসেবে দেখতে চাননি। তিনি মৃত্যুকে দেখেছেন চিরসত্য, শাশ্বত, মধুর এবং চির শান্তির একটি প্রবাহ স্বরূপ। একদিকে ঔপনিষধিক ভাবনা, অন্যদিকে যৌবনকালের তেজ এবং প্রচন্ডতা কবিকে বারবার ভুলিয়ে দিয়েছে মৃত্যুর বিভীষিকা। কিন্তু প্রকৃতির নিয়মকে অস্বীকার করার ক্ষমতা শুধু মানুষের কেন জীবকুলের কারোরই নেই। তাই না চাওয়া সত্ত্বেও মৃত্যুকে স্বীকার করতেই হয় শেষপর্যন্ত এবং এভাবেই অনিবার্যভাবে মৃত্যু প্রসঙ্গ জায়গা করে নিয়েছে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতায়।

‘মরণ’ কবিতায় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন -

“মরণ রে,
তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান।”[১৪]

কবির এই উক্তি থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে মৃত্যু কবির কাছে বিভীষিকাময় কিছু ছিল না। উপনিষদের মিষ্টি ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি জীবন এবং মৃত্যুকে অনন্তকালীন এক যাত্রা হিসেবেই দেখেছেন। মৃত্যুকে শ্যামের মতো কাঙ্খিত এবং আরাধ্য হিসেবে মনে করেছেন। রাধার কাছে শ্যাম যতটা আপন, যতটা প্রিয়জন; কবির কাছে মৃত্যুটাও যেন সেই রকমই কোনো একটা প্রিয় বিষয়। তিনি আরও বলেছেন -

“মৃত্যু-অমৃত করে দান।
তুঁহুঁ মম শ্যামসমান।।”[১৫]

কবির মতে মৃত্যু মানুষকে অমৃত দান করে। মৃত্যু মানুষকে শাশ্বত, চির সুন্দর করে তোলে। মৃত্যুর মধ্য দিয়েই বিলীন হয়ে যায় সমস্ত পাপ, তাপ এবং পূর্ণতা পায় একটি জীবন। তাইতো এই মৃত্য কবির কাছে কাম্য এক বিষয় ছিল। কবি মৃত্যুকে আহ্বান করে বলেছেন -

“তুঁহুঁ মম মাধব, তুঁহুঁ মম দোসর,
তুঁহুঁ মম তাপ ঘুচাও।
মরণ তু আও রে আও।।”[১৬]

নাট্যকার অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘নানা রঙের দিন’ নাটকে অভিনেতা রজনী বাবুর মুখ দিয়ে বলেছেন –

> “আমি লাস্ট সিনে প্লে করব না ভাই, আমাকে ছেড়ে দিন।”[১৭]

অর্থাৎ তিনি মহাকালের কাছে আর্জি জানিয়েছেন যেন তাকে মৃত্যুর জগতে না নিয়ে যাওয়া হয়। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এই সত্যটিকে চরমভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। সুন্দর এই ভবসংসারে চিরকাল বেঁচে থাকার এক তীব্র বাসনা কবির মধ্যে

থাকলেও তিনি জানতেন যে সশরীরে তিনি কোনোভাবেই বেঁচে থাকতে পারবেন না। তাই তিনি তাঁর সাহিত্য কর্মের মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকার এক অনবদ্য উপায় খুঁজে নিয়েছেন। কবি ‘প্রাণ’ নামক একটি কবিতায় বলেছেন -

“মানবের সুখে দুঃখে গাঁথিয়া সংগীত
যদি গো রচিতে পারি অমর- আলয়।
তা যদি না পারি, তবে বাঁচি যত কাল
তোমাদেরি মাঝখানে লভী যেন ঠাঁই,
তোমরা তুলিবে বলে সকাল বিকাল
নব নব সঙ্গীতের কুসুম ফুটাই।”[১৮]

কবির এই সাহিত্যকর্মের মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকার বাসনা আরও তীব্রভাবে ফুটে উঠতে দেখা যায় ‘সোনার তরী’ নামক একটি কবিতায়। যেখানে কবির সমগ্র জীবনের সাধনার সম্পদ মহাকাল গ্রহণ করে নিলেও সশরীরে সেখানে কিন্তু কবির জায়গা হয়নি। সাহিত্যকর্মের সাথে সাথে কবিকেও গ্রহণ করার আর্জি জানালে মহাকাল তার জীবনতরীতে একটুও জায়গা নেই বলে সেই দাবিকে প্রত্যাখ্যান করে দেয়। কবির ভাষায় সেই আকুল আবেদনটি হল -

“এতকাল নদীকূলে   যাহা লয়ে ছিনু ভুলে
সকলই দিলাম তুলে   থরে বিথরে-
এখন আমারে লহো করুণা ক’রে।।”[১৯]

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর অনেক কবিতায় মৃত্যুকে অমৃতের সাথে তুলনা করেছেন, আবার অনেক কবিতায় মৃত্যুকে দেখেছেন সুখ শান্তির এক আশ্রয় হিসেবে। যেখানে সমস্ত ক্লান্তির অবসান হয়ে যায়, যেখানে রয়েছে শুধুমাত্র শান্তি আর শান্তি। মৃত্যুর এই রকমই একটি রূপ ফুটে উঠেছে কবির ‘মৃত্যুর পরে’ কবিতার মধ্য দিয়ে। সেখানে তিনি লিখেছেন-

“আজিকে হয়েছে শান্তি,   জীবনের ভুল ভ্রান্তি
সব গেছে চুকে
রাত্রিদিন ধুঁকধুঁক   তরঙ্গিত দুঃখ সুখ
থামিয়াছে বুকে।”[২০]

আবার এই কবিতারই শেষের দিকে বলেছেন -

“যা হবার তাই হোক,   ঘুচে যাক সর্ব শোক
সর্ব মরীচিকা।
নিবে যাক চিরদিন   পরিশ্রান্ত পরিক্ষীণ
মর্তজন্মশিখা।
সব তর্ক হোক শেষ-   সব রাগ, সব দ্বেষ,
সকল বালাই।
বলো শান্তি, বলো শান্তি,   দেহ-সাথে সব ক্লান্তি
পুড়ে হোক ছাই।।”[২১]

- অর্থাৎ কবি বলেছেন মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মানুষ মুক্তি পেয়ে যায়, শান্তি পেয়ে যায়। পৃথিবীর সমস্ত মায়া-মমতা, চিন্তা-চেতনা সমস্তকিছু থেকে চিরতরে ছাড়া পেয়ে যায়।

‘মৃত্যু’ নামক এক কবিতায় কবি বলেছেন আমরা বৃথাই মৃত্যুকে নিয়ে ভয় পাই। মৃত্যু আদতে ততটা ভয়ানক নয়। মৃত্যুকে নিয়ে আমাদের মধ্যে যে অজ্ঞানতা, সেই অজ্ঞানতাই এই ভীতির কারণ। মৃত্যু সম্পর্কে এই অজ্ঞানতা যেদিন কেটে যাবে সেদিন মৃত্যু সম্পর্কে আমাদের ধারণাও পাল্টে যাবে। জীবনের মতো সেদিন মৃত্যুকেও আমরা ভালোবাসতে পারবো। কবির দৃঢ় বিশ্বাস তিনি জীবনকে যেমন ভাবে ভালোবাসতে পেরেছেন, মৃত্যুকেও ঠিক তেমনি ভাবেই ভালোবাসতে পারবেন। উক্ত কবিতায় তাই কবি জানিয়েছেন -

“জীবন আমার
এত ভালোবাসি ব’লে হয়েছে প্রত্যয়,
মৃত্যুরে এমনি ভালো বাসিবো নিশ্চয়।।”[২২]

কবির এইরূপ ভয়হীনভাবে মৃত্যুকে দেখার মতো একই ধরনের মানসিকতা ফুটে উঠতে দেখা যায় রাসসুন্দরী দাসী-র ‘আমার জীবন’ গ্রন্থের প্রথম ভাগের ত্রয়োদশ রচনায়। সেখানে তিনি বলেছেন –

> “এই পৃথিবীতে যত লোক দেখিতেছি, তাহার অধিকাংশ লোকেই মৃত্যুর নামে অতিশয় ভয় পাইয়া থাকে। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ভয়ের কারণ কিছুই নাই। লোকে না বুঝিতে পারিয়া মৃত্যুর আশঙ্কায় সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকে!”[২৩]

কবি বরাবরই জন্ম এবং মৃত্যুকে চিরন্তনের এক যাত্রা হিসেবে দেখেছেন। তাই তিনি মৃত্যুকে সীমাবদ্ধ এই জীবন থেকে মুক্তির উপায়স্বরূপ বিবেচনা করেছেন। কবির কাছে মৃত্যু শ্বাশ্বত, চিরসত্য এবং চিরকালীন একটি প্রবাহ। এই প্রবাহের মধ্য দিয়ে কবি প্রবাহিত হতে চেয়েছেন। নতুন নতুন রূপে সমগ্র বিশ্বসংসারে বিচরণ করতে চেয়েছেন। তাই তিনি ‘জন্ম ও মরণ’ নামক কবিতায় বলেছেন -

“কে চাহে সংকীর্ণ অন্ধ অমরতাকূপে
এক ধরাতল মাঝে শুধু এক রূপে
বাঁচিয়া থাকিতে! নব নব মৃত্যুপথে
তোমারে পূজিতে যাব জগতে জগতে।।”[২৪]

শেষ জীবনের কয়েকটি কবিতা ছাড়া কবি চিরকালই মৃত্যুকে দেখেছেন চির সুন্দর এবং চির শান্তির এক জায়গা হিসেবে। কবি তাই মৃত্যুকে দেখে কখনোই ভীত হয়ে পড়েননি। ‘মৃত্যুঞ্জয়’ নামক এক কবিতায় রয়েছে মৃত্যুর মিথ্যা দম্ভ ভাঙ্গার কথা। এখানে তিনি বলেছেন মৃত্যুকে দূর থেকে দেখে যতটা বড় বলে মনে হয়, সামনাসামনি ঠিক ততোটাই ছোটো। আর এভাবেই কবি রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুকেও অগ্রাহ্য করে হয়ে ওঠেন মৃত্যুর চেয়ে বড়ো। এইরকম মুহূর্তে কবি সোচ্চারে ঘোষণা করেন -

“যত বড় হও,
তুমি তো মৃত্যুর চেয়ে বড়ো নও
‘আমি মৃত্যু- চেয়ে বড়ো’ এই শেষ কথা ব’লে
যাব আমি চলে।”[২৫]

‘ইস্টেশন’ কবিতায় তিনি মানবজীবনকে স্টেশনের সাথেই তুলনা করেছেন। স্টেশনে দেখা যায় বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন দিকে যাত্রা। প্রতিটি মানবজীবনও সেইরকমই অনন্ত যাত্রার যাত্রী। চিরকাল ধরে যেখানে হয়ে চলেছে আসা-যাওয়া। তবে এই যাত্রা নিয়ে কবির মধ্যে কোনো আক্ষেপ নেই। কেননা তিনি লিখেছেন -

“চিত্রকরের বিশ্বভুবনখানি,
এই কথাটাই নিলেম মনে মানি।
কর্মকারের নয় এ গড়া- পেটা-
আঁকড়ে ধরার জিনিস এ নয়, দেখার জিনিস এটা।”[২৬]

‘আমার দিনের শেষ ছায়াটুকু’ কবিতায়ও কবির বিস্মরণের অতলে হারিয়ে যাওয়ার কথা রয়েছে। কবি বলেছেন একসময় তিনি থাকবেন না, কিন্তু থেকে যাবে তাঁর নানান আভাস, নানান গুঞ্জন; থেকে যাবে কবির নানান সৃষ্টি। স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথকে কেউ মনে না রাখলেও মানুষের হৃদয়ের অতলে চিরদিন থেকে যাবে তার নানান সৃষ্টিমূলক কীর্তি। তাঁর নিজের ভাষায় -

“আমার দিনের শেষ ছায়াটুকু মিশাইলে মূলতানে-
গুঞ্জন তার রবে চিরদিন, ভুলে যাবে তার মানে।”[২৭]

এর পরবর্তী পর্যায়ের কয়েকটি কবিতায় অর্থাৎ জীবনের অন্তিম প্রান্তে পৌঁছে তিনি ভিন্ন রকম এক ভাবনার দ্বারা চালিত হয়েছেন। এই সময়কার কবিতাগুলোর মধ্যে প্রথম জীবনের কবিতার মতো মিষ্টিক অনুভূতি সম্পন্ন ভাবনার দ্বারা চালিত হয়ে মৃত্যুকে আর ফুটিয়ে তুলতে পারেননি। কেননা যে উপনিষদের ভাবধারায় কবি সারাজীবন ধরে চালিত হয়ে এসেছিলেন, সেই ভাবনায় বাঁধা পরে এই পর্বে এসে। এমনকি এই সময়ে কবি ভগবানের অস্তিত্ব সম্পর্কেও সন্ধিহান হয়ে পড়েন। কবিকে বারবার বিভিন্ন প্রশ্ন ছুড়ে দিতে দেখা যায় সৃষ্টিকর্তার প্রতি। তিনি ‘প্রথম দিনের সূর্য’ নামাঙ্কিত কবিতায় লিখেছেন -

“দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল
পশ্চিমসাগরতীরে
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়-
কে তুমি ?
পেল না উত্তর।।”[২৮]

এখানে উঠে আসা প্রশ্ন ‘কে তুমি?’[২৯] এই প্রশ্ন আসলে কবির নিজের প্রতি নিজের, এই প্রশ্ন বিশ্বসংসারের প্রতি এবং সবশেষে এই প্রশ্ন সৃষ্টিকর্তার প্রতি। আলোচ্য কবিতার ভাবধারা থেকেই পাওয়া যায় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুচেতনার ভাবনায় মোড় বদল-এর ইঙ্গিত। পূর্বে যেখানে তিনি মৃত্যুকে দেখে এসেছেন চিরসত্য এবং চিরন্তন এক প্রবাহস্বরূপ, সেখানে তিনি এখন ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই সন্ধিহান হয়ে পড়েছেন এবং মৃত্যুকে নতুন করে দেখতে শুরু করেছেন অনিশ্চয়তার এক ক্ষেত্রস্বরূপ। তাইতো জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে লিখা ‘রূপনারানের কূলে’ নামক একটি কবিতাতেই তিনি উজাড় করে দিয়েছেন তাঁর জীবনের সমস্ত খেদোক্তি। এখন তিনি জগৎ সম্পর্কে আবার নতুনভাবে উপলব্ধি করেন। জীবনকে নতুন দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিচার করেন। প্রতিনিয়ত ঘটে যাওয়া নানান আঘাত- বেদনার মধ্য দিয়ে নিজেকে নতুন ভাবে চিনতে শেখেন। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সত্যে উপনীত হন যে মৃত্যু নামক কঠিন বাস্তবতার মধ্য দিয়েই আমাদের জীবনের পরিসমাপ্তি, তাই আমাদের সকলেরই সেই কঠিন সত্যকে স্বীকার করে নেওয়া উচিত। কেননা সত্য কঠিন হলেও সেটি কখনোই আমাদের বঞ্চনা করে না। কবির ভাবনায় -

“সত্য যে কঠিন,
কঠিনেরে ভালোবাসিলাম-
সে কখনো করে না বঞ্চনা।”[৩০]

এখন কবি বুঝতে পেরেছেন মৃত্যু নামক কঠিন সত্যই মানুষের জীবনের চরম পরিণতি এবং এই মৃত্যুর মধ্য দিয়েই প্রতিটি মানুষ তার জীবনের সমস্ত দেনা পরিশোধ করে দিয়ে মুক্ত হয়ে যাওয়ার সুযোগ পায় জীবনবেদী থেকে। লক্ষ্য করার বিষয় এই পর্যায়ে কবি বারবার মৃত্যুকে কঠিন বলে উল্লেখ করেছেন। মৃত্যু কবির কাছে এখন কঠিন এক সত্য বলে উদ্ভাসিত হয়েছে। তবে এই কঠিন সত্যই মানুষের সর্বশেষ পরিণতি। কবির ভাষায়-

“আমৃত্যুর দুঃখের তপস্যা এ জীবন-
সত্যের দারুন মূল্য লাভ করিবারে,
মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ করে দিতে।।”[৩১]

পরিশেষে বলা যায় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতায় বারবার ফুটে উঠেছে মৃত্যুচেতনা। তবে কবি রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবন ধরে এই মৃত্যু ভাবনা তার গতিপ্রকৃতি বদলাতে থাকে। কখনো তিনি মৃত্যুকে আপন ভেবে, মধুর ভেবে আলিঙ্গন করে নিয়েছেন, আবার কখনো কঠিন ভেবে পরিত্যাগ করার জন্য শিউরে উঠেছেন। কবির মৃত্যুচেতনাকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে প্রাথমিক জীবনের মৃত্যুচেতনার সাথে কবির পরবর্তী জীবনের মৃত্যুচেতনার মধ্যে স্বাতন্ত্রতা রয়েছে, রয়েছে মৌলিকত্বও। প্রথম পর্যায়ে ঔপনিষদিক ভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়ে মৃত্যুকে দেখেছেন চির সুন্দর, চির মধুর এবং চির আনন্দময় এক উপলব্ধি রূপে। কালের পর কাল ধরে বিকশিত হয়ে চলেছিল এই সমস্ত উপলব্ধি।

জীবনের এই প্রবাহ ছিল তাই মৃত্যুহীন। কবি মৃত্যুকে কল্পনা করেছেন কখনো অমৃতের স্বরূপ হিসেবে, কখনো বন্ধু হিসেবে, কখনো প্রেমিক হিসেবে আবার কখনো বা চির শান্তির এক আশ্রয় হিসেবে। কিন্তু শেষ জীবনের দিকে কবি হয়ে পড়েন সংশয়বাদী। এই সংশয় নিজেকে বুঝতে এবং জানতে, এই সংশয় সৃষ্টিকর্তাকে খুঁজে পেতে। প্রথমে যেখানে দেবতার প্রতি নানান স্তুতিবাক্য প্রয়োগে রুচি দেখিয়েছেন, সেখানে পরবর্তীকালে স্রষ্টাকে জানার প্রতি, বোঝার প্রতি এবং স্রষ্টার প্রতি নানান প্রশ্নকরণেই বেশি উদ্যোগী ছিলেন। শেষ পর্যায়ে কবি মানব জীবন, মানবজগৎ এবং সবশেষে এই সমস্ত কিছুর আয়োজক-এর প্রতি অনুসন্ধিৎসু হয়ে পড়েছিলেন। তাই কবির শেষ জীবনের কবিতাগুলো থেকে সৌন্দর্য, মাধুর্য এবং আনন্দ প্রভৃতি অপসারিত হয়ে গিয়ে উন্মোচিত হয়ে যায় মৃত্যুর কঠিন একটি রূপ। যে রূপ কবিকে বাস্তব সত্যে উপনীত হতে সাহায্য করেছে, মৃত্যুর সম্যক ধারণাকে প্রদান করেছে।

Reference:

১. ভট্টাচার্য, সমরেন্দ্র, সাম্মানিক নীতিবিদ্যা, বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, ৩৫, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা- ৭৩, পুনর্মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৪, পৃ. ১৭১
২. সিংহ, রতিরঞ্জন (প্রকাশক), জিজ্ঞাসা, শিবনারায়ন দাস লেন, কলিকাতা-০৬, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৬০, পৃ. ৫
৩. সাহা, ঐশানী (প্রকাশিকা), সঞ্চয়িতা, ৭, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, তৃতীয় সংস্করণ, বইমেলা ২০১১, পৃ. ৬২২
৪. সাহা, ঐশানী (প্রকাশিকা), বঙ্কিম রচনাবলী (সাহিত্য সমগ্র), ৭, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, জন্মাষ্টমী ২০১২, পৃ. ২২৯
৫. মল্লবর্মণ, অদ্বৈত, তিতাস একটি নদীর নাম, মাইতি বুক হাউস (প্রকাশক), ৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, চতুর্থ মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ৯৭
৬. আইয়ুব, আবু সায়ীদ, আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ, দে’জ পাবলিশিং, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা- ৭৩, দ্বাবিংশ সংস্করণ, মাঘ ১৪২৪, পৃ. ৩৫
৭. সাহা, অর্জুন (প্রকাশক), রবীন্দ্র উপন্যাস সমগ্র, ৭, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা- ৭৩, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৪২০, ১ লা বৈশাখ, পৃ. ৬৩৮
৮. সাধুখাঁ, বিকাশ (প্রকাশক), রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য, ৯/৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা- ০৯, দ্বিতীয় প্রকাশ, ২২ শে শ্রাবণ ১৪১০, পুনর্মুদ্রণ, জুলাই ২০১৯, পৃ. ৮০
৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, জীবনস্মৃতি, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ (প্রকাশক), ৬, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-১৭, পুনর্মুদ্রণ, কার্তিক ১৪২৪, পৃ. ১৫১
১০. তদেব, পৃ. ১৫২
১১. তদেব, পৃ. ১৫৪
১২. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, আমার সাহিত্য- জীবন, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি (প্রকাশক), ১/১, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-২০, পঞ্চম মুদ্রণ, মাঘ ১৪২৬, পৃ. ৫০
১৩. দত্ত, পি. (প্রকাশক), নাটক সমগ্র (দ্বিতীয় খন্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, দ্বিতীয় মুদ্রণ, আশ্বিন ১৪০৯, পৃ. ৮৮
১৪. সাহা, ঐশানী (প্রকাশিকা), সঞ্চয়িতা, ৭, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা- ৭৩, তৃতীয় সংস্করণ, বইমেলা ২০১১, পৃ. ১৩
১৫. তদেব, পৃ. ১৩
১৬. তদেব, পৃ. ১৩
১৭. পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ (প্রকাশক), সাহিত্যচর্চা, ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কর্পোরেশন লিমিটেড (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ), প্রথম উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ সংস্করণ, এপ্রিল ২০১৭, পৃ. ৫০
১৮. সাহা, ঐশানী (প্রকাশিকা), সঞ্চয়িতা, ৭, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা- ৭৩, তৃতীয় সংস্করণ, বইমেলা ২০১১, পৃ. ২২-২৩

১৯. তদেব, পৃ. ৭১
২০. তদেব, পৃ. ১৫৪
২১. তদেব, পৃ. ১৫৯
২২. তদেব, পৃ. ৩১৮
২৩. দাসী, রাসসুন্দরী, আমার জীবন, প্রজ্ঞাবিকাশ, ৯/৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা- ০৯, পুনর্মুদ্রণ, অক্টোবর ২০১৯, পৃ. ৯২
২৪. সাহা, ঐশানী (প্রকাশিকা), সঞ্চয়িতা, ৭, শ্যামাচরণ দি স্ট্রিট, কলকাতা- ৭৩, তৃতীয় সংস্করণ, বইমেলা ২০১১, পৃ. ৩৪৩
২৫. তদেব, পৃ. ৪৮১
২৬. তদেব, পৃ. ৫৯৩
২৭. তদেব, পৃ. ৬০৮
২৮. তদেব, পৃ. ৬২৩
২৯. তদেব, পৃ. ৬২৩
৩০. তদেব, পৃ. ৬২৩
৩১. তদেব, পৃ. ৬২৩